বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ঃ প্রথম যুগ

—শ্রীসুকুমার সেন

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের কোন স্থান ছিল না। তাহা থাকিবারও কথা নয়, কেন না তখনকার দিনে সাহিত্যিক রস-বোধের প্রেরণা ছিল মুখ্যতঃ আবেগ ও গৌণতঃ অনুভূতির মধ্যে। আর গদ্য সাহিত্যে রস-বোধের প্রেরণা আসে প্রধানতঃ বোধ ও যুক্তিজ্ঞান হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান সকল আর সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ লোককে খুশী করা, যে সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ, সুবিধা বা যোগ্যতা লাভ করে নাই। আরও একটা কথা আছে, তখনকার সাহিত্য ছিল কাব্যমূলক এবং সেই কাব্য ছিল সঙ্গীতমূলক। অর্থাৎ এখনকার মত সেকালে কাব্য পড়া হইত না, গাওয়া হইত। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, এই কারণে সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত লোকও এই "পাঁচালী"[১] সাহিত্যে আনন্দ লাভ করিত।

গীতিমূলক হওয়াতে সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন কথা-বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর না থাকায় কেবলই চর্বিত-চর্বণ চলিতেছিল এইরূপ বোধ হয়। আর কথা-বস্তুর মধ্যেও পৌরাণিক অপেক্ষা লৌকিক বা ছদ্ম-পৌরাণিক কাহিনীর আদর অত্যধিক ছিল। সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতার অভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে সেকালের লোকের সাহিত্যিক রুচির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই মুখ্যতঃ হীন-কথামূলক সাহিত্যে লোকের রুচি বিগড়াইয়া দিয়াছিল আর ইহাতে যে দেশের নৈতিক অবনতির বৃদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম বঙ্গের এক সুসভ্য অঞ্চলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক রুচি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়া বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বলিয়াছেন—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক বলিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
গোপীপাল গোপীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে গ্রামের সমস্ত।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

[অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়]।

এই সাহিত্যে বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ও করুণ রসের একটা দিক ছিল। তাহা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্য-গীতি। সীতা-রাম-গীতির মধ্যেই তখন সাহিত্যে বিশুদ্ধ রস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে রামায়ণ কাহিনী শুনিয়া যবনেরও মন করুণ রসে আর্দ্র হইয়া যাইত।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে বলিয়াছেন—
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥

যাহা হউক পঞ্চদশ শতকের শেষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে। গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বসু খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩—১৪৮০ সালে "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমনে ও প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর হইয়া গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালায় যে সুর আনিয়া দিল তাহার প্রতিধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও, এখনো পর্য্যন্ত বাজিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানতঃ আবেগমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটী শাখা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-

---

১ পুরাতন বাঙ্গালায় এই ছন্দ-গীতি-মূলক সাহিত্যকে "পাঁচালী" বলা হইত। মালাধর বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' (১৪৭৩—১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) রচনার কৈফিয়তে বলিয়াছেন—

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥

সাহিত্য। বোধ ও যুক্তিমূলক সাহিত্যের সূত্রপাত ইহারই মধ্যে। এই সাহিত্যও ছন্দে রচিত। তাহার কারণ, সাধারণ লোক ছন্দঃ বা গীতি না হইলে গ্রাহ্য করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, অনতিস্বল্প-পরিসর পয়ার ১ ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার সরলবাক্যমূলক রীতি সুন্দর অবকাশ পায়। বাঙ্গালা গদ্যের তালের সহিত পয়ারের আট ও ছয় মাত্রার মতের সহিত সুসঙ্গতি ও ঐক্য আছে। সুতরাং পয়ারের মধ্যে দিয়া ভাবপ্রকাশের বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। বরঞ্চ সুবিধাই হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের জড়তামুক্তি খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। ষোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা অনুমান করিতেও ভয় হয়। পয়ারের মধ্যে সংস্কৃতমূলক অব্যয়, অথবা অসমাপিকার প্রাচুর্য্য অথবা তালবিহীন বাক্যজালপ্রয়োগের সুযোগ একেবারেই নাই, এজন্য পয়ারের ছাঁদে পর পর সরল বাক্যের মধ্য দিয়া স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। সকল রকম ভাবপ্রকাশে পয়ার ছন্দের কতদূর ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহার প্রমাণ মিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে।

তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠিপত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে। ষোড়শ শতকে লেখা চিঠি শুধু একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে।২ পত্রটী ১৪৭৭ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৫৫৫ সালে) লিখিত হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটী আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লেখেন। এই পত্রটীর মধ্যে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব প্রত্যন্তের উপভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সাধু ভাষার রূপ বাঙ্গালা গদ্যে একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আরও একটী লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। সপ্তদশ শতক হইতে চিঠিপত্রাদিতে কিছু কিছু আরবী ফারসী কথা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই পত্রটীতে কিন্তু সে সব কিছুই নাই। পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

… … লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিত্তাপ বিদায় দিবা।… …

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে রচিত নিজেদের সাধনা বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে এইরূপ পুস্তক কেবল পদ্যেই রচিত হইত। গদ্যে রচিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ গুরু শিষ্যের মধ্যে কথোপকথনমূলক হইত। সপ্তদশ শতকের কোন হস্তলিপি না পাওয়া যাওয়ায় এই গদ্যের ভাষাকে ঠিক সপ্তদশ শতকের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এইরূপ বৈষ্ণব সাধন-গ্রন্থের প্রাচীনতম পুঁথির তারিখ অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বে নহে। সুতরাং এই গদ্যের ভাষা পরে আলোচনা করা যাইবে।

শূন্যপুরাণে অল্প কিছু গদ্যাংশ আছে। শূন্যপুরাণ সপ্তদশ শতকে লেখা। অনেকে ইহাকে সুপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শূন্যপুরাণের গদ্যাংশ ছড়া মাত্র, ইহাকে গদ্য বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। এই ছড়া বা মন্ত্রগুলি ভাঙ্গা পয়ারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কিছু তুলিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে পয়ারের রেশ বিলক্ষণ অনুভূত হইবে।

পশ্চিম দুয়ারে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত খাটে নির্দ্দান করি দিব।১

---

১ পয়ারই বাঙ্গালার মূল ও বিশিষ্ট ছন্দঃ, আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারেরই সবিশেষ প্রাধান্য। ত্রিপদীর প্রয়োগ খুবই অল্প ছিল, ইহার প্রয়োগ হইত প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের জন্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারের প্রাধান্যের ফলে ছন্দের আর এক নাম দাঁড়াইয়া যায়, 'পয়ার'। শ্যামাধব বসুর উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭২ দ্রষ্টব্য।

১ "শূন্যপুরাণ," পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ৮১।

ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে পোর্ত্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা দেশে আগমন ঘটে। ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ দুইখানি পুস্তক যে খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।১ পোর্ত্তুগীসদের রচিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ষোড়শ শতকের শেষপাদে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অবধি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। এই খ্রীষ্টানি সাহিত্যের উদ্ভব ঢাকা অঞ্চলে হইয়াছিল, সুতরাং ইহার মধ্যে যে উক্ত অঞ্চলের উপভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যরীতি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অধিকন্তু এই সাহিত্যের উদ্ভব পোর্ত্তুগীস পাদ্রির হাতে এবং ইহার মূল পোর্ত্তুগীস ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে, সেই জন্য ইহার বাক্য-রীতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ঢঙ্গ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও দেখা যায় যে তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছে। এই গদ্যের ভঙ্গি ও বাক্যরীতি পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তনিও প্রণীত প্রশ্নোত্তরমালা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ভূষণার এই রাজকুমারকে ১৬৬৩ সালে মগেরা বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। এক পোর্ত্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে মগেদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লয়েন ও তাঁহাকে রোমান কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ["পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্পসাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ", প্রবেশক, পৃষ্ঠা ৸৹]। দোম্ আন্তনিও রচিত এই বইখানি একটী খ্রীষ্টান পাদ্রি ও এক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিচার লইয়া রচিত। বইখানি ছাপা হয় নাই। ইহার মূল পাণ্ডুলিপি পোর্ত্তুগালের এভোরা নগরে আছে

১ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ৬৭-৬৮ ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* পৃঃ ২৯৭ ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত "পাদ্রি মানোএল্ দা-আস্‌সুম্পসাম্ রচিত বাঙ্গালা-ব্যাকরণ" প্রবেশক, পৃঃ ৸৹ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এভোরা নগরে গিয়া এই বইটীর অধিকাংশ নকল করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং তাহার কিয়দংশ ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার "উপাসনা" পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই বইটীর সাহায্য অপরিহার্য্য। বইটীর সম্পূর্ণ মুদ্রণ অত্যাবশ্যক। বইটী রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ। পোর্ত্তুগীস পাদ্রিরা এই রকমই করিতেন।

দোম্ আন্তনিওর বইটীর নাম অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—"জনৈক খ্রীষ্টান অর্থাৎ রোমান কাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা জেণ্টুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার ; ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় জেণ্টুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র কাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সম্বন্ধ আছে।" ১

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্পসাম্ এই পুস্তকটী পোর্ত্তুগীস ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই বইটীর যতটুকু অংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের গদ্য-রীতির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ দিয়াই বাক্যের সমাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুস্তকের ভাষায় লাবর্গ, তুমর্থ বা শত্রর্থ অসমাপিকাযুক্ত বাক্যাংশ অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদের ব্যত্যাস্‌ও (inversion of the normal word order) যথেষ্ট রহিয়াছে। নঞ্ শব্দ ক্রিয়ার পূর্ব্বেই বেশী ভাগ ব্যবহৃত হইয়াছে, কচিৎ ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তো' 'সে' ও 'যে' শব্দের বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ সুপ্রচুর। 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট, 'বল' বা 'বোল' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম ; আর এই ধাতুটী ইংরেজী tell বা command এইরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'করিলা,' 'পাইবা' ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ সম্মানসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে। সম্মানসূচক 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এখনও আসে নাই। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি 'রে', 'কে' নহে। পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী প্রশ্নার্থক 'নি' ও নিশ্চয়ার্থক ও

১ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ", উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃঃ ৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

সমর্থনসূচক 'হয়' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রকাশিত অংশটুকুর মধ্যে কোন আরবী ফারসী শব্দ নাই। প্রকাশিত অংশ হইতে কিছু এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম[১]।

[ব্রাহ্মণ] হয়; বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারো কপালে শুধা(,)[২] লিখন দেখি নাহি(;) আমিও এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারণ কি? তুমি কহ কি কারণ কারো এমত থাকে, কারো এমত না থাকে?

[রোমান কাথলিক] কারণ এই (,) কারো কপালের হাড়[৩] জোড়া[৪] থাকে তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা কপালের হাড়ের[৫] জোড়া[৪] কসাইয়া[৬] চাও এইখনে খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে; তিনি এমত গড়িয়াছেন[৭], যাহার হাড়[৩] জোড়া না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখ তাহার শিরপীড়া[৮] অধিক না জন্মে, যাহার কপালে জোড়া[৪] হাড়[৩] তাহার জোড়াতে[৪] জল ভর করিয়া মুণ্ডে বেদনা[৯] করে; এহার অর্থ এই; লিখন যে কহে এ মিথ্যা[১০] দেখ; সেই মস্তকের চৌদ্দা জোড়া[৪], সেও সেইরূপ জোড়াগঠন[১১] (,) এহাতে বুঝিবে লিখন হয় কি নহে; এ কথা অতি মূঢ়ের[১২], যে কহে কপালের লিখন।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তকে রোমান লিপ্যন্তরীকরণ হইতে ঢাকা অঞ্চলের তৎকালীন কথ্যভাষার উচ্চারণতত্ত্বের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার কিছুকিছু বিশিষ্ট পদ বা বাক্যরীতির পরিচয় থাকিলেও ইহা মূলতঃ সার্ব্ববঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহাও অবশ্য সত্য যে ষোড়শ শতকে শেষের দিকে উচ্চারণভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিত পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার বর্ত্তমান সময়ের মত এত তফাৎ ছিল না।

আর একটী পুস্তকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া পোর্ত্তুগীস প্রভাবান্বিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালার প্রস্তাব শেষ করিব। যে পুস্তকটীর কথা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। বইটীর নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এবং ইহার রচয়িতা (বা পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদকারী) পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম। বইটী ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া লিসবন শহর হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানিতে খ্রীষ্টানধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরছলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আস্সুম্প্সাম ঢাকা অঞ্চলে থাকিতেন সুতরাং ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপ ইহার মধ্যে যথেষ্টই আছে। আস্সুম্প্সামের রচনারীতির প্রধানতম দোষ হইতেছে পোর্ত্তুগীস রীতির অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ। তাহা অবশ্য সর্ব্বত্র নহে।

দোম আন্তনিওর পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে নঞ্ শব্দের প্রয়োগ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে পরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। আস্সুম্প্সামের ভাষা দোম আন্তনিওর ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষার অনেক বেশী কাছাকাছি। পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদ বলিয়া আর পোর্ত্তুগীসের রচনা বলিয়া স্থিত পদ সমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের ব্যত্যাস (inversion of the normal word order) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"কে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

'করুক', 'করিবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, দোম আন্তনিওর পুস্তকে এই প্রয়োগ দেখা যায় নাই। সুতরাং এই প্রয়োগ যে সাধুভাষাসম্মত নহে, পরন্তু প্রাদেশিক কথ্যভাষামূলক, ইহা নিঃসন্দেহ। 'আমার গো' (=আমার), 'আছিল', 'স্বপন না যায়', 'পাইবার' (=পাইতে), 'আঠু করিয়া' (=হাঁটু গাড়িয়া) ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষা হইতে গৃহীত। 'আমারদিগের', 'তাহার-দিগকে' ইত্যাদি প্রয়োগ দুই পুস্তকেই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত-'দিগ',-'দে' বিভক্তির প্রয়োগ পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যে উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে মিলে না। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার দান? "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"এর ভাষার আর একটী বড় গলদ-'ইবা' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার মূলক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃপদের সহিত প্রয়োগ। আরও, আস্সুম্প্সাম্ অনেকক্ষেত্রেই বর্ত্তমান অনুজ্ঞার সহিত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্ত গলদ সত্ত্বেও আস্সুম্প্সামের ভাষার স্বচ্ছতা ও গতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

১ উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯ পৃষ্ঠা ৩৫৯।

২ বক্রনীস্থিত বিরামচিহ্ন মূলে নাই।

৩ har হার। ৪ zora জোরা। ৫ harer হারের। ৬—কসাইয়া। ৭ gariassen গরিয়াছেন। ৮ xirpira শিরপীরা। ৯ bedena বেদেনা। ১০ mitha মিথা ১১ zoragothon জোরাগঠন। ১২ murer মুরের।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" হইতে একটী কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আধুনিক বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের এক পূর্ব্বতম রূপ বলিয়া ইহাকে নেওয়া চলে।

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন[১] পুরুষ শত্রু[২] আছিল; বিস্তর দিন তাহারা এক জনে আর জনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কত্তের দিন হয় ঘড়ি[৩] দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে নাগাল পাইল; নাগাল পাইয়া দুই জনেও তরোয়াল খসিয়া[৪] মারামারি করিল। যে জনে বেশ জেজোবন্ত সে আরো এক চোট, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয়[৫] হইল। পরাজয় হইয়া শত্রুরে[৬] মাফ চাহিয়া কহিল: ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর; তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন। জিবনিয়া[৭] কহিল: খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল, রক্ত পৌঁছাইল[৮], ঔষধ[৯]ও দিল, পরে দুই জন মিলিয়া বড়[১০] দোস্ত হইল। জিবনিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঁঠু[১১] করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন আকৃতিএ আঠের[১২] দিল খসিয়া[৪], তাহারে আলিঙ্গন দিলেন। এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল, এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিবনিয়া পরমেশ্বরের পূজা দিল; যত দিন বাঁচিল[১৩] অনেক পুণ্য করিল। বৃদ্ধ[১৪] কালে পুণ্যে পূর্ণিত মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।[১৫]

দোম আন্তনিওর পুস্তক রচনাকাল হইতে আসসুম্প-সামের পুস্তক রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ বছরের অনধিক নহে। ইহারই মধ্যে এত বিদেশী (আরবী ফারসী) শব্দ ঢুকিয়া গেল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে। দোম আন্তনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক সাধু ভাষার লেখকদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষায় বিদেশী শব্দের অপ্রাচুর্য্য বা অসদ্ভাব।[১৬] আর আসসুম্পসাম কথ্যভাষার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত সুপরিচিত বিদেশী শব্দগুলিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দোম আন্তনিওর বিষয়বস্তুও বিদেশী শব্দপ্রয়োগের সুযোগ দেয় নাই, ইহাও স্বীকার্য্য।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত যে কয়েকখানি চিঠি বা দলিল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গদ্যের সরল রূপ একেবারেই নাই। প্রথমতঃ ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহার হইত না, তাহাতে বাক্যের আদি ও অন্ত বুঝা দায় হইয়া উঠে। একই বাক্যের মধ্যে বিবিধ কর্ত্তৃপদযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্য ও সংযোজক অব্যয়ের প্রাচুর্য্যে পাঠককে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৭১৭ সালে লিখিত একটী দলিল হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

…আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখের করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন…

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় নিজেদের সাধন-প্রণালীর উপর বই লিখিতেন। প্রথমে এইরূপ বই পদ্যে লিখিত হইত। পরে, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ হইতেই, গদ্যে বা মিশ্র গদ্যে পদ্যে এই সকল পুঁথি রচিত হইত। এইরূপ কতকগুলি পুঁথি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কতক-গুলি বৈষ্ণব মোহান্তের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। খুব সম্ভব এইগুলি এত প্রাচীন নহে। সপ্তদশ শতকে লিখিত কোন অনুলিপিও পাওয়া যায় না, তবে ভাষার ভঙ্গিটি হইতে অনেক সময় ইহাদের রচনাকালের একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। গদ্যে লিখিত এই সব গূঢ়তত্ত্ব সংবলিত পুস্তক গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত। ছোট ছোট বাক্য, ক্রিয়া পদ প্রায়ই উহ্য থাকে। বাক্যে পদের পারম্পর্য্য অনেক সময় বিপর্য্যস্ত দেখা যায়, তাহার কারণ অজ্ঞান বা অক্ষমতা নহে। গদ্যের ভিতর পদ্যের ছন্দঃ বা তাল আনিবার চেষ্টা। যেমন—

মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কর। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে।

অষ্টাদশ শতকের লেখা গ্রন্থে বাক্যরচনার জটিলতা পর পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব সাধকদিগের লেখায় অসমাপিকার অপপ্রয়োগ নাই, পদের বা বাক্যাংশের অযথা ব্যত্যাসও নাই। একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সরল বাক্যের প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে। ক্রিয়াপদের মধ্যে কেবল ভবিষ্যৎ কালের রূপে কিছু কিছু আধুনিক রূপ পাওয়া যায়। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ অথবা দুর্ব্বোধ্য নহে, বরং গাম্ভীর্য্যময় ও ওজস্বী। নিম্নে এইরূপ একটী গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অজ্ঞানী জীবে কহে এখন বুঝিলাম কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় দিয়ে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং মন দিয়ে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন বায়ু ভূতের স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না।

১ colim. ২ xotro. ৩ soe gori. ৪ =খসাইয়া। ৫ pora xoe. ৬ xotrere. ৭ যে জিনিয়াছে; 'জিন্নে'। ৮ ponsfailo. ৯ oxodio. ১০ boro. ১১ anthu. ১২ ather. আনুনাসিকের অভাব লক্ষণীয়। ১৩ banxilo. ১৪ Birdho. ১৫ "আসসুম্পসামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবেশক, পৃঃ ৯, ৬.

১৬ দোম্ আন্তনিওর গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হইলে এই সম্বন্ধে দৃঢ় করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না।

এই রচনাটী হইতে দেখা যাইতেছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙ্গালার সাধুভাষার গদ্যরীতি সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে সাহিত্যে গদ্যের এই সম্পূর্ণাঙ্গপ্রায় রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ভিক্ষুক বৈষ্ণবের রচিত ও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ও 'ভদ্র' সমাজের নজরে পড়ে নাই। ফলে সাধুভাষায় সাধারণ সাহিত্যের গদ্যের উৎকর্ষ সাধন হইতে আরও পঞ্চাশ বৎসর বেশী লাগিয়া যায়। সাহিত্যিক গদ্য রচনার প্রচেষ্টা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের গোড়া হইতে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আশ্রয়ে নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। যাঁহারা এই নূতন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর বৈষ্ণব গদ্য সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল, সেই কারণ, হয় তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বা ইংরেজীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইল, অথবা নিজের মনগড়া ছাঁদে সংস্কৃত, ফারসী, সাধু ভাষা ও কথ্যভাষার খিচুড়ী করিয়া এক অদ্ভুত গদ্যের সৃষ্টি করিতে হইল। তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যবহারোপযোগী ব্যাকরণ লিখিত হয় নাই, সুতরাং এই নূতন গদ্যস্রষ্টাদের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা মূলতঃ কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পথ অনেকটা সুগম ছিল এবং তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের—ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি।

রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভাষা বড়ই অদ্ভুত রকমের; ইহার জন্য তখনকার ভাষা দায়ী নহে, দায়ী গ্রন্থকার ও তাঁহার অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান। তৎসম শব্দ অনেক ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু তৎ সকল প্রায়ই অপপ্রযুক্ত ও বানানদুষ্ট। তদ্ভব শব্দকে অনেক সময় ভ্রান্ত তৎসম রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন 'গাত্র মোচন' ('<মোছা') করিতেছিলেন' ইত্যাদি। 'পদার্পণ হইলেন' ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদেরও যথেষ্ট অপপ্রয়োগ আছে। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা অনেক ক্ষেত্রে '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত হেতুবাচক, অতীত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'করিতেছেন' 'করে' (=করিতে লাগিলেন), 'হইয়াছিল না' (=হয় নাই) ইত্যাদি অসাধু প্রয়োগও নিতান্ত কম নহে। তবে ইহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ দায়ী করা সঙ্গত নয়, কারণ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহারের বাঁধাধরা নিয়ম তখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ক্রিয়মান বর্ত্তমান (present progressive) তখনকার দিনে প্রায়ই (বিশেষ করিয়া কোন ঘটনা বা গল্পের বর্ণনায়) সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইত। বিধিলিঙের অর্থে এখন আমরা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকি। রামরাম বসুর পুস্তকে কিন্তু ঐ অর্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদেরই প্রয়োগ হইয়াছে। 'আসিয়া' 'যাইয়া' এই দুই পদের ক্রিয়াপদের সহিত নিরর্থক (enolitic) প্রয়োগ খুব লক্ষণীয়।

'অস্তি' বা 'ভবতি' বাচক ক্রিয়াপদ প্রায়ই বাক্যমধ্যে বা বাক্যশেষে লুপ্ত করা হইয়াছে, ইহাতে সম্পূর্ণ বাক্যকে বাক্যাংশের সহিত গোলমাল করিয়া দিয়াছে। "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"-এর দুর্ব্বোধ্যতার ও অদ্ভুতত্বের প্রধান কারণ হইতেছে বিধেয় বিশেষণ, কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারক এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যাংশের ক্রিয়াপদের পরে প্রয়োগ। কর্ত্তৃপদও অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাক্যমধ্যে অসংযুক্ত বাক্যান্তরের প্রয়োগ (parenthesis) উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙ্গালা গদ্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ রামরাম বসুর পুস্তকে এত বেশী করা হইয়াছে যে পাঠককে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, রামরাম বসুর ভাষায় দেখা যায় যে ভাষা সরলতর হয় নাই, উপরন্তু জট আরও বেশী করিয়া পাকাইয়াছে।

'কহ' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ কিছু বাড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ইহার অর্থের স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

"রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"-এ সম্ভ্রমার্থক মধ্যম পুরুষ সর্ব্বনাম পদ "আপনি" শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত, সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালাতে হিন্দীভাষা হইতে আসিয়াছে।[১] অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৎসত্ত্বেও উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক, এমন কি তাহার পরেও, সম্ভ্রমজ্ঞাপনার্থ 'আপনি' শব্দের সহিত 'তুমি' শব্দেরও প্রয়োগ যথেষ্ট হইত।

রামরাম বসুর লিখিত গদ্যের নমুনা স্বরূপ "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এই মতে কতককাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুণানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনারদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অধিক ক্ষমতাপন্ন।

---

১ *Origin and Development of the Bengali Language* পৃ ৮১০-৮১৮ দ্রষ্টব্য।

কানমগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তিদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে উৎখাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের "কথোপকথন"১ও প্রকাশিত হয়। এই বইটীর রচনাকার্য্যে কেরি কতিপয় দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্য লইয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কেরির কত দূর দখল ছিল তাহার সাক্ষ্য এই পুস্তকে প্রচুর পাওয়া যায়। এক হিসাবে কেরিকে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের অন্যতম জনক বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। যাহা হউক, এখন "কথোপকথন"-এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থে সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চলিত ভাষায় লিখিত প্রস্তাব গুলির ভাষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল। ইহাতে অনুমান হয় যে এইগুলির রচনায় কেরি দেশীয় লোকের বিশেষ সাহায্য লইয়াছিলেন। আর চলিত ভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলির মধ্যে একাধিক অঞ্চলের কথ্য ভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "তিয়রিয়া কথা" সন্দর্ভটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহার ভাষা মূলতঃ হাবড়া হুগলি অঞ্চলের উপভাষা। 'হাড়ে', 'আতি', 'কড়ে' ইত্যাদি রূপে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-ভঙ্গির ছাপ রহিয়াছে, এ গুলিকে উপভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। 'করিছে' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে শুদ্ধীকরণের চেষ্টা দেখা যায়।

হাড়ে (=হারেং) স্তেগো মাচকে যাবি কিনা (,) আতি (=রাতি) তো কোয়া কোয়া করিছে। মুই ধুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

যা এক কাপ কড়ে (=করে) আইয়াছে। হাঁ মাগ পড়েছে এখন কি জালে যাবাড় (=যাবার) সময়। যা চেঁদে তুই (,) মুই তো এখন যাব না। কালি চেড় (=চের) আতি থাকতে গিয়াছিনু। যাড় বলে খাবার মাচ পেনু না (,) তাতো আজি ম্যাগ পড়েছে।

হাড়ে ভাই ম্যাগের তরে মোদের কাম চলে না। ভাবে তো মাগ হাওয়ালকে ভাত কাপড় দিমু। তোর বড় দেখি হুকবাসের (='সুখ বাসা'র) শড়ীল হইয়াছে। [পৃঃ ৪৬]।

সাধু ভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলিতেও কেরি মাঝে মাঝে কথ্য ভাষার রীত্যনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে গদ্যের ভাষায় বৈচিত্র্য হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করায় ভাষার গৌরবহানি ঘটিয়াছে, যেমন 'সারথিকে (=কোচম্যানকে) হুকুম দেহ'; 'মদিরা আমার সঙ্গে খাইবা।'

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি '-কে', '-রে' বিভক্তির প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সম্ভ্রমার্থক 'আপনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহাশয়' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। সামান্য অতীত অনেক সময় সম্পন্ন অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। '-বা' প্রত্যয়ান্ত তুমর্থ বা চতুর্থ্যর্থক শব্দের পরিবর্ত্তে '-অন (-ওন)' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বাক্য মধ্যে অসংলগ্ন বাক্যান্তরের প্রয়োগ (parenthesis) নাই বলিলেই হয়। সামঞ্জস্যহীন দুই বা তদধিক বাক্যের সংযোজন খুবই কম। মোটের উপর বলিতে গেলে "কথোপকথন"-এর গদ্যে জটিলতা আদৌ নাই। নিম্নে উদ্ধৃত "ঘটকালি" শীর্ষক সন্দর্ভটী পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল। সেই সময়ের সাহিত্যের গদ্যরচনার সহিত তুলনা করিলে ইহার ভঙ্গি অনবদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে বন্ধনীমধ্যে বিরাম-চিহ্ন বসাইয়া দিলাম।

ঘটক মহাশয় (,) আমার বড় পুত্রটির বিবাহ দিব (;) আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন (;) বিস্তর দিবস পৌষ না হয় (,) বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাহে। আমি বিবাহ দিয়া কাশীযাত্রা যাব১ (;) এখন না হইলে যে পরে পর আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় (,) তাহার ঠেক কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগায় কন্যা উপস্থিত আছে (;) যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়া আসি। কুলীনগ্রামে হরহরি একটি কন্যা আছে (;) সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ (,) যেন দুধে আলতায় গোলা (;) আর কর্ম্মাও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে (;) তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস (;) আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।

ঘটক যাইয়া হরিহর বসুকে বলিতেছেন (:) বসুজা মহাশয় হে (,) তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য (;) তাহারা জাত্যংশেও যেমন আর অন্ন যোগে সচ্ছল আছে (;) সে ব্যক্তি নিজে বয়েশী চাকুরা। পুত্রটি অতি সুজন (১) লিখিতে পড়িতে মুর্ত্তিমন্ত (,) দৃশ্য ভব্য সভ্য (,) অল্প বয়স (:) এমন পাত্র আর পাবা না (,) ইহা বুঝিয়া জবাব দেহ (;) কিন্তু তাহারা দেরি সহিবে না (,) এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে।

আমার এ কার্য্য অবশ্য করা বটে (,) কিন্তু এ মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না (।) যদি অগ্রহায়ণাদিতে কার্য্য করেন তবে আমি পারি (,) নতুবা হয় না।

শুনহে বসুজা (,) এমন বর আর মিলিবে না (।) তুমি যদি কর এমন হয় (,) তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি (।) তাহা কল (;) আমি তাহাদিগকে আনিয়া পত্র করিয়া যাই।

ভাল। যাও আন যাইয়া (।) এই মাসের দশদিন এক দিন আছে (;) তোমরা শরয় ডাকাতি (=ডাকাডাকি) আইস।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বসিলেন (।) পত্রাদি লেখাপড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাগ্দান করিলেন।

১ *Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language*, By W Carey D. D. ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ অবলম্বনে এই আলোচনা করা হইতেছে।

২ বন্ধনীস্থিত অংশ প্রবন্ধকারের সংযোজন।

১ সপ্তদশ শতকের শেষ হইতেই ভবিষ্যৎ কালের সংক্ষিপ্ত (contracted) রূপ সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দোম্ আন্তনিও ও আস্সুম্পসাম্-এর লেখায় ইহা দেখা যায়।

তোমরা সকলে শুন (:) ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল (।) যদি প্রজাপতির নির্বন্ধ থাকে তবে ফাল্গুন মাস গেলে আগামি বৈশাখ মাসে শুভক্ষণে বিবাহ হবেক।

বর কর্ত্তাও বলিলেন (।) তোমরা শুন (:) ইহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইল (:) যদি বিধাতার নির্বন্ধ থাকে তবে হবে (।) উনিও আয়োজন করুন আমিও করি গা। [পৃঃ ৩৮, ৪০, ৪২]।

"কথোপকথন" প্রকাশের এগার বৎসর পরে (১৮১২ সালে) কেরির "ইতিহাসমালা" প্রকাশিত হয়।[1] ইহার ভাষা সরল বটে তবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের মত নহে। ইহাতে সাধুভাষার প্রতি কেরির ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা বোধহয় "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের" আবহাওয়ার দরুণ। কেননা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়ও দেখা যায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সাধুভাষার প্রতি পক্ষপাতিতা ও সেই হেতু ভাষার কৃত্রিমতা ও জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেরির এই বইখানিতে মধ্যে মধ্যে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অসমানকর্ত্তৃক (absolute) প্রয়োগ ও বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণমূলক বাক্যাংশের (adjectival and adverbial clauses and phrases, বিপর্য্যস্ত প্রয়োগ ছাড়া ব্যকরণঘটিত অন্য জটিলতা বিশেষ কিছু নাই। 'করিলেক', 'কহিলেক' ইত্যাকার ক্রিয়া পদের প্রয়োগ

গোলোকনাথ শর্ম্মা কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদও ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়।[1] এই পুস্তকের বাক্যবিন্যাসরীতি হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী। জিজ্ঞাসার্থক সর্ব্বনামের যুক্ত প্রয়োগ এই গ্রন্থের ভাষায় অনন্যসুলভ বিশেষত্ব।[2] অসম্পন্ন বর্ত্তমান সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোলোকনাথের ভাষায় কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

অপরঞ্চ কাকের জাল ফেলায় ন্যায় (;) অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় (,) তাহা দৈবয় বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে (।) যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না খায় তবে কখন পাবে না; অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন শোভিত হয় (,) যেমন হংসের মধ্যে বক।[3]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখকদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান খুবই উচ্চে, এমন কি প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইনি চারিখানি গ্রন্থের রচয়িতা —"বত্রিশসিংহাসন", "রাজাবলী", "হিতোপদেশ"[4] ও "প্রবোধ-চন্দ্রিকা"। "বত্রিশ সিংহাসন" ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়, "রাজাবলী" ১৮০৮ সালে ও "প্রবোধচন্দ্রিকা" ১৮৩৩ সালে।[1]

মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে সাধুভাষার ও সংস্কৃত রীতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ গদ্যের ভঙ্গি সরলতা হইতে জটিলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল।

বত্রিশ সিংহাসনের ভাষা বেশ সরল। 'ছিল' অর্থে 'হইয়াছিলেন', 'থাকে' ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। শীলার্থ অতীত (habitual past)-এর স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ খুবই লক্ষণীয়। সংযোজক অব্যয় 'ও' 'এবং' প্রত্যেক শব্দের সহিত যোগ করা হইয়াছে। 'যে' শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ উক্তি (direct speech) সুরু করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।

"রাজাবলী" ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহা তিন বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে রচিত হয় [রাজাবলী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৭]। এই গ্রন্থে আরবী ফারসী শব্দ যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজাবলীর ভাষা মোটামুটি সরল তবে সংস্কৃতমূলক জটিল রীতি স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাজাবলীর রচনা-রীতির নমুনা হিসাবে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গোরের বাদশাহ গয়াসুদ্দিন যবনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন হিজরি ৫৩৯ সনে আপন বিক্রমে গজনের অধিকার করিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মূলতান দেশ জয় করিয়া তথায় আপনার অনেক আমীরকে নায়েব করিয়া রাখিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। তাহার পর দ্বিতীয় বারে ৫৭০ হিজরি সনে রেস্তহাম দিয়া গুজরাট দেশে আসিলেন, সে দেশে রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া গজনেনে পলাইয়া গেলেন।

"রাজাবলী"র অধিকাংশই এইরূপ সুখপাঠ্য সরল রীতিতে লিখিত।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠচিত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত হইতেন, এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন, এ দুই কুজ্ঞানী পরদার-দার-নিষ্ঠ-চিত্ত হইয়া নির্লজ্জ ছিল, অতএব দিগম্বর হইয়াছিল, এবং সাংসারিক যাবৎ বিষয়েতে পরম বৈরাগ্য সম্পন্ন সাধুপুরুষেরা ভস্ম বিভূষিত হইতেন, এই দুষ্ট কুযোগী বেশেতে বৈরাগী, কিন্তু ব্যবহারেতে মহারাগী ছিল, এমন লোকের মুখে ছাই উপযুক্ত হয়, অতএব আপনি মুখে ছাই মাখিত।[2]

এই অংশটীর রীতি সংস্কৃতানুগ হইলেও সরলতার ও সুবোধ্যতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

"হিতোপদেশ"-এর ভাষা খুবই সংস্কৃতানুগ, প্রায় প্রবোধ-চন্দ্রিকার মতই। ইহার ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভাবার্থক

১ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩০।

২ যেমন, 'কোন কাহার মুখে শুনিলেন।'

৩ বন্ধনী মধ্যস্থ বিরাম চিহ্ন প্রবন্ধকার প্রদত্ত।

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে "হিতোপদেশ" ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল [লং (Long) সাহেবের মতে ইহা ১৮০১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল] *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য।

১ সুশীলবাবু অনুমান করেন যে "প্রবোধচন্দ্রিকা" ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ১৮১৩ সালে ছাপা হইয়াছিল।

২ রাজাবলী হইতে উদ্ধৃত এই অংশে দুইটিতে যে কমা (comma) চিহ্ন আছে তাহা বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই মনে হয়।

বিশেষ্যপদের কর্ম্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ (যেমন, 'মতি সমতাকে পায়') আর বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের অব্যবহিতপূর্ব্বে গৌণকর্ম্ম এবং তাহার পূর্ব্বে মুখ্যকর্ম্মের প্রয়োগ।

"প্রবোধচন্দ্রিকা" লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। "প্রবোধচন্দ্রিকা" মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার মধ্যে তিনি অনেক বিষয় এবং অনেক রীতি দেখাইয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্য গ্রন্থকার এই বইটীর মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছু ঢুকাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার মধ্যে অনেক কিছু আমাদের নিকট তুচ্ছ অথবা অবান্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা ও রচনার বিভিন্ন ভঙ্গি বইটীকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে—(১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যের রীতি এবং (৩) সংস্কৃতরীতি। মৌখিক রীতি কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় অথবা সর্ব্বলোকের বোধগম্য করিবার জন্য কতকগুলি মাত্র বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধুরীতিতেই পুস্তকখানির অধিকাংশ রচিত। সংস্কৃত রীতি কেবল সংস্কৃত হইতে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক বা আলঙ্কারিক তথ্যে বা বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এযাবৎ "প্রবোধচন্দ্রিকা" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই তৃতীয় রীতিকে এই পুস্তকখানির মূল রচনারীতি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রীতি কেবল বিদেশীয় ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই (স্থানে স্থানে মাত্র) অবলম্বিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক ভাষার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কথ্যভাষামূলক রচনা স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ম্বর। স্থানে স্থানে অবশ্য (এখনকার রুচির হিসাবে) অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু রচনার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি সাধনই করিয়াছে। মার্শম্যান (Marshman) সাহেব প্রবোধচন্দ্রিকার ভূমিকায় ঠিকই বলিয়াছেন যে ইতর শ্রেণীর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে সরসতার (humour) সঞ্চার করিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন।[১] ইতর ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় ইতরশ্রেণীর ভাষাকে জোরাল করিয়া তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয়। এই রীতির উদাহরণ হিসাবে এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

পুত্রস্নেহে কাতরা হইয়া মহারাজ মাতা কুন্তী মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, ওলো দাসীরা! দেখ তো সে সর্ব্বনাশে আমারে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ ঝেড়ে, কেহ সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ খেংরা, কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশীরাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জন তর্জ্জন ভর্ৎসন করত, যে রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! খর্ব্ব-পাংশুল রণকাতর যুদ্ধ পরাঙ্মুখ নির্ল্লজ্জ খট্টারূঢ় ব্যলীক নিঃসাহস সহিস কুড়িয়া বেটা! তোর নিমিত্তে আমারদের জীব,—মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, খুড়া, খুড়ী, জেঠা জেঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাসুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহাই, বেহানী, শালা, শালী, ভাইজ, ভাইবউ, ভাএরা ভাই, ভাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাগত প্রতিপালন ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতাত্যাগে অপারক হইয়া, তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্। ছি! ছি! ধিক্ তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন। ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে কুলকলঙ্ক! তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোল্লায় যা, চুলায় যা, যাঙ্কুতো যা পাতে, নাতি মার, ঝাটা মার, জুতা মার, যেও মার, তোর জন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ, এবম্বিধ বহুবিধ কটুকথায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।[১]

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-র সাধুরীতির মধ্যে দুইটী ধারা আছে—একটী সরলতর অপরটী জটিলতর। সরলতর ধারাটী কাহিনী বা বর্ণনায় (narration) অনুসৃত হইয়াছে, আর জটিলতর ধারাটী বিবরণে (description, statement) অবলম্বিত হইয়াছে। এই দুইটী ধারার উদাহরণ পর পর দেওয়া গেল।

(১) অতিবড় দরিদ্র এক ব্যক্তি থাকে, তাহার নাম সেকবিদ্রি। সে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইয়া কুক্কুট-কুক্কুটী এক যোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া নবকুক্কুল অতিশয় স্রোতোবতীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল।—তাহা বেচিয়া ছাগছাগী ও ভেড়াভেড়ী কিনিব, তাহারদেরও বৎসবৎসা যথেষ্ট হইবে, সে সকল বাচ্চাবাচ্চি ও তাহদের দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহাতে গরু কতক মহিষ ক্রয় করিব, তাহাতে বৎসের ও দুগ্ধ দধি ঘৃত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহারদের চর্ম্ম ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও বলীবর্দ্দেতে চাস করিয়া যে শস্য পাইব, তাহার বিক্রয়ণে বহু টাকা কড়ি পাইব।—তাহাতে ঘোড়া-ঘোড়ী অনেক কিনিব, তাহারদের বাচ্চা বিক্রয় করিব, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি হইবে। তদনন্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া পরম সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যাতে ঐ ভার্য্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সূপকার অন্নব্যঞ্জন পরমান্ন কৃশর, অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া যখন আমাকে ডাকিবে যে কর্ত্তা মহাশয়! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি কহিব, যা বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না।

---

১ The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower order, the vulgarity of which however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour.

১ প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত সকল অংশই বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে। কমা (comma) ও বিরাম-চিহ্ন মূলে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হয় মার্শমান নয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপে মনে মনে করত যেমন মাথা নাড়া দিয়াছে, তেমন ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া ঘূর্ণীরূপ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল।

(২) অতএব ইদানী ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্কপটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয়, অন্যথা বিশ্বাসের অভাব-প্রযুক্ত কার্য্যারম্ভে নিষ্পাপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট। যদ্যপি অন্যোন্যে বাধ্যবাধকতাহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজনবিশেষে সমবায়ে তৈলবর্ত্তি-শিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির ন্যায় অর্থসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব উভয় বিশ্বাসে পরস্পর সখ্য হইলে পরস্পরের সাহায্যে শত্রু হইতে দুষ্টের ত্রাণ সম্ভাব্যমান হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের তৃতীয় অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক রীতি প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রায়ই তৎসম শব্দঘটা ও সমাসপরম্পরা আছে, তাহা হইলেও বাক্যরীতি বাঙ্গালারই, দৈবাৎ দুই এক স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদপ্রণালী বুঝা যাইবে।

হে রাজপুত্র! সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব যোগলোকের পদ্মমাত্রপুষ্পা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি- মুনি-কর্তৃক অনুশাসিত সংস্কৃত যে বাক্য সকল, তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত্ত হয়। যেহেতুক যদি শব্দনাম জ্যোতি একজগতের শেষ পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধকারময় হইত। দর্পণেতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দেখ বাঙ্ময়রূপ দর্পণের এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান বস্তু সকল, তাহাও দেখা যাইতেছে। 'ইত্যাদি'।

ইহার মূল দণ্ডীর "কাব্যাদর্শ"-এর এই শ্লোকগুলি—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্ম্ম
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।
ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে।
ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ম্।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্যনশ্যতি। [১, ১, ৩-৫]

ইত্যাদি

কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরণাত্যচ্ছ-নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

ইহাও "কাব্যাদর্শ"স্থিত এই শ্লোকটীর অনুবাদ—

কোকিলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ।
উচ্ছলচ্ছীকরাচ্ছাচ্ছনির্ঝরাম্ভঃকণোক্ষিতঃ। [১, ৪৮]।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। 'দ্বারা' প্রভৃতি কর্ম্মপ্রবচনীয় প্রয়োগ না করিয়া '-তে' বিভক্তির দ্বারা করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। কর্ম্মকারকের '-কে' বিভক্তি অনেক সময় ভাববাচক ও জড়বস্তু-বাচক বিশেষ্যের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুবচনান্ত পদের সহিত পুনর্ব্বার বহুবচনের বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্টই দেখা যায়। (যেমন, স্ত্রীবর্গেরা, পক্ষিসমূহেরা, মুনিগণেরা, ধাত্রীদিগেরা, ইত্যাদি)। গৌণকর্ম্মে '-রে' বিভক্তির প্রয়োগ খুবই কম। সম্মানবাচক মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনাম পদ 'আপনি' শব্দের রূপে '-আপনকারা,' 'আপনকাকে,' 'আপনকার,' 'আপনকার-দের,' ইত্যাদি প্রয়োগ। 'নিমিত্ত'বাচক 'জন্ত' শব্দের প্রয়োগ খুবই অল্প। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাতেই এই প্রয়োগ প্রথম মিলিল। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্ত্তে 'পাওত,' 'করত,' 'হওত' ইত্যাদি ক্রিয়ামূলক পদ ও 'পূর্ব্বক' 'করণক' 'প্রযুক্ত' প্রভৃতি পদের দ্বারা সমাস-যুক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শীলার্থ অতীতের (**habitual past**) স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। '-তে' প্রত্যয়ান্ত ভাববচন '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, কিন্তু সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল নহে)। 'রহ' ধাতুর পরিবর্ত্তে 'থাক' ধাতুর প্রয়োগ। 'পারিয়াছিল না,' 'না হও' (=হইও না), 'হও না' (=নহ) ইত্যাদি প্রয়োগ। আরম্ভ বুঝাইতে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ। লাজা (লাজ শব্দের বহুবচন, =খই), কীশ (=বানর), অপত্রপা (=লজ্জা), কহ্ব (=বক), অক্রবাণ (=বাক্যহীন), একপদে (=শীঘ্র) ইত্যাদি অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাক্যসমূহের সংযোজন (যথা, স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগ করিয়া নব্য লোকেতে অনুরাগ যে করে তাহার ভাল হয় না ও স্বামীদ্রোহ যে করে, সে দুরবস্থা-প্রাপ্ত অবশ্য হয়, ও ভাবী আশ্রয়কে সম্যক পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিবে না)।

গিলক্রিষ্ট (Dr. J. Gilchrist) সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮০৩ সালে ইংরেজী হইতে ৬টী দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সমেত "ঈশপ্‌স্ ফেব্‌ল" রোমান হরফে প্রকাশিত হয়।১ বাঙ্গালা অনুবাদ অংশ তারিণীচরণ মিত্র রচিত। ইহার ভাষা সরল ও সুবোধ্য তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজীর রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহা হইতে একটী গল্প২ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল এক টুকরা পোনীরের আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁক-শিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আমি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতিঃ, যদি মিত্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। আনন্দোন্মত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে ভুলিয়া তাহাকে

১ *History of Bengali Literature in the 19th Century.* পৃঃ ১৮৫। ২ ঐ, পৃঃ ১৮৬-৮৭।

আপন করের পরিপাটি দেখাইবার জন্তে মুখ খুলিলেক তখন পোষীর নীচে পড়িল, তাহা তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিল, আর হাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা শরিমায় খেদ করিতে রাখিয়া গেল।

ইহার ফল এই, যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।

এই পুস্তকেই বোধ হয়, দেশীয় ভাষার পক্ষে ইংরেজী বিরাম-চিহ্নের প্রথম প্রয়োগ।

হরপ্রসাদ রায়ের "পুরুষ-পরীক্ষা"[১] ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বিদ্যাপতি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, "পুরুষ-পরীক্ষা" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই পুস্তকের ভাষার বিশেষত্ব এই। বিশেষণ পদকে যে সে শব্দের দ্বারা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে (যেমন, নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়)। '-ইয়া ও '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে 'করত' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ। 'করণক' শব্দের সহিত সমাস করিয়া করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা। একই বাক্যের মধ্যে সম্ভ্রমসূচক 'তুমি' ও 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ (যেমন, হে ভূপাল, তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিবেনও না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাহার আগমনের কহিতে পারি আপনি কিছু ভয় করিবেন না)। একটী খুব লক্ষণীয় প্রয়োগ হইতেছে 'কহ' ধাতুর স্থলে 'বল' ধাতুর প্রয়োগ। এইরূপ প্রয়োগ অবশ্য অল্প স্থলেই করা হইয়াছে। অন্যত্র 'বল' ধাতুর প্রয়োগ যদিও পাওয়া গিয়াছে, তথাপি তথায় ইহার অর্থের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, সেখানে 'বল' ধাতুর অর্থ ইংরেজী ক্রিয়া tellএর ন্যায়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের পূর্বে প্রয়োগ খুবই অল্প। 'বটে' এই ক্রিয়াপদ জিজ্ঞাসাসূচক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে)। একাধিক বাক্যের পর ছেদচিহ্ন স্থাপন প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের একটী বিশেষত্ব বটে, কিন্তু "পুরুষ-পরীক্ষা"-য় ইহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩৯।৪০ দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে রাজা রামমোহনের স্থান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরেই। রামমোহনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। রামমোহন সাহিত্য রচনা বিশেষ কিছু করেন নাই, তাঁহার লেখা প্রায় সবই তর্ক বা বিবাদমূলক। তথাপি তাঁহার হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তখনকার দিনের বাঙ্গালা গদ্যের দুর্বোধ্যতা নষ্ট করিবার জন্য রামমোহন বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের গদ্যে সাহিত্যিক গুণ কিছু থাক বা না থাক, ইহা যে তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন এক একটী বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। খুব অল্প স্থলেই তিনি একাধিক বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। রামমোহনের ভাষার বিশেষত্ব এই গুলি। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া পদের প্রয়োগ (যেমন, কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজ্যপ্রাপ্তি হয়)। 'না' শব্দের ক্রিয়ার পূর্বে প্রয়োগ। 'করা' এই ভাববচনের পরিবর্তে 'করিবা' এই ভাববচনের প্রয়োগ (যেমন, তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন ; অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না)। গুণবাচক বা জড়বস্তুবাচক শব্দের কর্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। গৌণ কর্মের পূর্বে মুখ্য কর্মের প্রয়োগ। কর্তৃহীন ক্রিয়াপদের (impersonal verb) প্রয়োগ।

রামমোহনের ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্বে কেহ পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তথাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়।

রামমোহনের পরেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথা বলিতে হয়[২]। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে বাঙ্গালা

১ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। উহাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে রুচিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার রচনারীতি মৃত্যুঞ্জয়ের রীতির অনুযায়ী নহে। ১৮৩০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণেও ইহা হরপ্রসাদ রায়ের রচনা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "সমাচার-দর্পণ" তখনকার দিনের প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিতেছি। (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (প্রথম ভাগ) পুস্তকে উদ্ধৃত অংশগুলি অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা যাইতেছে)। ১

একাধিক বাক্যের পরে ছেদ ব্যবহার হইয়াছে। 'ও' 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতির বাক্যের যোজনা করা হইত। অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ কম। বড় বড় সমাসের ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। -'অন' প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব ভাববচনের প্রয়োগ যথেষ্ট। আরম্ভবাচক 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ। 'যে' শব্দের দ্বারা মুখ্য উক্তির (direct speech) আরম্ভ। বিধিলিঙের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম। 'আমারদিগের' ইত্যাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। ক্রিয়াপদের বিভিন্নকালের প্রয়োগ স্থিরীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

সংবাদ পত্রের রচনার নমুনা হিসাবে ১৮২৫ সালের 'সমাচার-দর্পণ' হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসী রাজমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আওড়িখড়ী গ্রামের মিত্রবংশের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যাযাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহ মধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল (ইত্যাদি)।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের আলোচনা এক রকম হইল। মাসিক পত্রিকার কলেবরে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে বলিয়া অনেক লেখকের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলাম না। যাঁহারা প্রধান লেখক তাঁহাদের রচনারীতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই যুগের অবসান হয় খ্রীষ্টীয় ১৮৪৭ সালের দিকে। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয়।

"বেতাল পঞ্চবিংশতি"র প্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইল। এই যুগের ইতিহাস প্রবন্ধান্তরসাপেক্ষ। এইবার প্রথম যুগের রচনার বৈশিষ্ট্যের একটা মোটামুটি হিসাব দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

[শব্দরূপ ও প্রয়োগ] ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের পর 'দিগ', 'দের' বিভক্তির প্রয়োগ। এই প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম রামমোহন রায়ের লেখায়। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে -'রে' ও -'কে' এই দুই বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলেও -'রে' বিভক্তির প্রয়োগ পর পর কমিয়া আসিয়াছে। গুণবাচক ও জড়বস্তুবাচক বিশেষ্য পদের কর্ম্ম কারকে -'কে' বিভক্তির প্রয়োগ। 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতি করণ কারকবাচক শব্দের অপ্রয়োগ, তৎস্থলে '-তে' বিভক্তির সুপ্রচুর প্রয়োগ। আধুনিক বাঙ্গালায় চতুর্থী বিভক্তিতে নিমিত্তবাচক 'জন্য' শব্দের অপ্রয়োগ (মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় ও তারিণীচরণ মিত্রের লেখায় দুই একবার পাওয়া গিয়াছে)। দুই বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'অপেক্ষা' 'চাহিয়া' প্রভৃতি পদের অপ্রয়োগ, শেষের দিকে 'হইতে' শব্দের চলন আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভ্রমবাচক 'আপনি' শব্দের রূপে 'আপনকার', "আপনকারদের," 'আপনকাকে', 'আপনকারা' পদের চলন যথেষ্ট ছিল। 'তুমি' শব্দের সম্ভ্রম-বাচকতা তখনও ছিল, কারণ ইহা 'আপনি' শব্দের সহিত একত্রে প্রযুক্ত হইত। আরম্ভ অর্থে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ।

[ক্রিয়া পদের প্রয়োগ] অসম্পন্ন বর্ত্তমানের সামান্য অতীতের স্থলে প্রয়োগ। শীলার্থ অতীতে- (habitual past)-র স্থলে বর্ত্তমানের প্রয়োগ। 'পারিয়াছিল না', 'না হও', ইত্যাকার অপপ্রয়োগ; (ইহার উদাহরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়)। সম্ভাবনা অর্থে অনুজ্ঞা পদের সহিত 'যদ্যপি' শব্দের প্রয়োগ। অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার (copula) প্রয়োগ; প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে 'অত' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ, অর্থ বা 'পূর্ব্বক' ইত্যাদি শব্দের সহিত সমাস। '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে সপ্তম্যন্ত ভাববচনের প্রয়োগ। 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ অত্যল্প; 'বল' ধাতুর অর্থ 'কহ' ধাতু হইতে একটু পৃথক ছিল।

[বাক্যাংশ ও বাক্যের প্রয়োগ] বিশেষণ শব্দ ও বাক্যাংশ ঘুরাইয়া বলা (periphrasis)। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের স্থান বিপর্য্যয়। এক বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ (parenthesis)। 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন ধাঁচের বাক্যের সংযোজন। এক ছেদের মধ্যে একাধিক বাক্যের প্রয়োগ। কমা (comma) প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্নের অসদ্ভাব।

---

১ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, পৃঃ ৮৬-৮৭।